بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল-খামেস (আই.)-এর ২৬ ডিসেম্বর, ২০২৫ মোতাবেক ২৬ ফাতাহ, ১৪০৪ হিজরী শামসীর জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

গত খুতবায় আমি মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সীরাত (তথা জীবনচরিতের) আলোকে কিছু কথা বলেছিলাম। আজ খোদাপ্রেমের প্রেক্ষাপটে তাঁর জীবনচরিতের কিছু দিক তুলে ধরব। হতে পারে কিছু কথা সংক্ষেপে পূর্বেও আলোচিত হয়েছে, তবে এখানে কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিশদ বিবরণও রয়েছে।

আমরা লক্ষ করি, তাঁর জীবনচরিতের এই দিক থেকে তাঁর প্রতি আল্লাহ্ তা'লার ভালোবাসারও বহিঃপ্রকাশ ঘটে। কেবলমাত্র আল্লাহ্ তা'লার প্রতি তাঁর ভালোবাসাই নয়, বরং তাঁর প্রতিও আল্লাহ্ তা'লার (গভীর) ভালোবাসা ছিল। তাঁর প্রতি আল্লাহ্ তা'লার ভালোবাসার নিদর্শন হিসেবে তিনি তাঁকে পথপ্রদর্শন করেছেন। পরবর্তীতে এই ভালোবাসায় আরো সিক্ত হয়ে তিনি (সা.) বিস্ময়করভাবে নিজের উম্মতের (সদস্যদের) তরবিয়ত করেছেন এবং উম্মতকে পথপ্রদর্শনও করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর প্রতি যে শিক্ষা অবতীর্ণ করেছেন, উম্মতের পথনির্দেশনার জন্য তাদের কাছে তিনি নিখুতভাবে তা পৌঁছিয়েছেন; এর জন্য তাঁর হৃদয়ে এক গভীর বেদনা ছিল। মূলত এই বেদনার কারণেই আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে পথনির্দেশনা দিয়েছেন, কেননা তাঁকে উম্মতকেও পথপ্রদর্শন করতে হবে। কিংবা এভাবে বলা যায়, একদিকে তাঁর হৃদয়ে ছিল আল্লাহ্র ভালোবাসার বেদনা, আর অন্যদিকে ছিল আল্লাহ্র সৃষ্টির প্রতি মমত্ববোধ এবং তাদেরকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার তীব্র আকাঙ্ক্ষা। আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনের সূরা আদ-দুহায় বলেন, وَوَجَدَكَ ضَآلًّا فَهَدَىٰ অর্থাৎ **'যখন তিনি তোমাকে তোমার জাতির চিন্তায় ব্যাকুল দেখেন, তখন তাদের সংশোধনের সঠিক পথ তোমাকে বাতলে দিয়েছেন।'** আর আল্লাহ্ তা'লার প্রতি ভালোবাসার নিরিখে এই আয়াতের অর্থ দাঁড়াবে– আল্লাহ্ তা'লা বলছেন, **'আমি তোমাকে আমার ভালোবাসায় অত্যন্ত ব্যথিত পেয়েছি এবং পরিশেষে তোমাকে সেই পথ দেখিয়েছি যাতে পরিচালিত হয়ে তুমি আমার সান্নিধ্যে পৌঁছতে পেরেছ।'** ইমাম রাযী প্রণীত **তফসীরে কবীর**-এ সূরা আদ-দুহার এই আয়াত তথা, وَوَجَدَكَ ضَآلًّا فَهَدَىٰ –এর ব্যাখ্যায় লেখা হয়েছে, ضلال শব্দের একটি অর্থ **ভালোবাসা**ও হয়। যেমন আল্লাহ্ তা'লার বাণীতে বলা হয়েছে, إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ–এখানে ضلال মানে ভালোবাসা। কাজেই এর মর্মার্থ হবে– তুমি আমার প্রেমিক; তাই আমি তোমাকে এমন সব পথের দিকে পরিচালিত করেছি যার মাধ্যমে তুমি তোমার প্রেমাস্পদের সেবা করে নৈকট্যের সোপানগুলো অতিক্রম করতে পারো। এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা সনদ দিয়ে দিয়েছেন যে, **তুমি আল্লাহ্র ভালোবাসায় বিভোর।**

তাঁর সাথে আল্লাহ্ তা'লার এই ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ আমরা বিভিন্ন বর্ণনায় দেখতে পাই। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক জায়গায় বলেন: যে ব্যক্তি কুরআনের বাচনভঙ্গি সম্পর্কে অবগত, তার কাছে এটি গোপন নয় যে, দয়াময় ও কৃপালু আল্লাহ্ কখনও কখনও তাঁর বিশেষ বান্দাদের জন্য এমন কিছু শব্দ ব্যবহার করেন যা বাহ্যত শুনতে কিছুটা

অসুন্দর মনে হতে পারে, কিন্তু অর্থের নিরিখে তা অত্যন্ত প্রশংসনীয় ও স্তুতিমূলক বাক্য হয়ে থাকে। [বাহ্যত এই শব্দটির সাধারণ ব্যবহার দেখলে মনে হয় শব্দটি উপযুক্ত নয়; কেননা যাল শব্দের অর্থ ভ্রষ্টতা। কিন্তু এক্ষেত্রে অর্থ তা নয়।] যখন আল্লাহ্ তাঁর বিশেষ বান্দাদের জন্য কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে সেটি ব্যবহার করেন, তখন এর অর্থ বদলে যায়। যেমনটি আল্লাহ্ তা'লা তাঁর নবী (সা.) সম্পর্কে বলেছেন, وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ [অর্থাৎ, আর তিনি তোমাকে তোমার জাতির প্রেমে আত্মহারা পেয়েছেন এবং তিনি তোমাকে তাদের সংশোধনের জন্য হিদায়াত দান করেছেন (সূরা আদ-দুহা: ৮)]। এটি **জানা কথা, অভিধানবিদদের মুখে মুখে 'যাল' শব্দের প্রচলিত ও সুপরিচিত অর্থ হলো পথভ্রষ্ট।** তিনি (আ.) বলেন, এ দৃষ্টিকোণ থেকে এ আয়াতের অর্থ দাঁড়ায়, হে রসূল! আল্লাহ্ তা'লা তোমাকে পথভ্রষ্ট পেয়েছেন এবং তোমাকে হিদায়াত দিয়েছেন। [অর্থাৎ সাধারণ লোকেরা এই অর্থ করে থাকে।] তিনি (আ.) বলেন, অথচ মহানবী (সা.) কখনও পথভ্রষ্ট হন নি। কেউ যদি মুসলমান হয়েও এই বিশ্বাস পোষণ করে যে, মহানবী (সা.) তাঁর জীবনের কোনো এক পর্যায়ে ভ্রষ্টতামূলক কার্যকলাপে লিপ্ত ছিলেন– তবে সে কাফির, বে-দ্বীন এবং শরীয়তের বিধান অনুযায়ী দণ্ডনীয়। বরং এখানে এ আয়াতের সেই অর্থ করা প্রয়োজন যা আয়াতের পূর্বাপর থেকে বুঝা যায়। আর তা হলো, মহানবী (সা.) সম্পর্কে প্রথমে মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন,

أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'লা তোমাকে এতিম ও অসহায় পেয়েছেন এবং নিজের সন্নিধানে আশ্রয় দিয়েছেন। আর তোমাকে 'যাল' অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লার প্রেমে বিভোর ও আত্মহারা পেয়েছেন, তাই আল্লাহ্ তা'লা তোমাকে নিজের দিকে টেনে নিয়েছেন আর তোমাকে নিঃস্ব দেখতে পেয়ে তিনি তোমাকে প্রাচুর্য দান করেছেন।

হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, মহানবী (সা.) যেহেতু নিজের অভ্যন্তরীণ পবিত্রতা, হৃদয়ের উদারতা, নিষ্কলুষতা, লজ্জা-সম্ভ্রম, সত্যবাদিতা, বিশ্বস্ততা ও বিশ্বাসযোগ্যতায়, আল্লাহ্র ওপর ভরসা ও আস্থা এবং খোদাপ্রেমের সকল আবশ্যকীয় বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে সব নবীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ, উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন, সবচেয়ে মহান, পূর্ণতম এবং সবচেয়ে উজ্জ্বল ও সবচেয়ে স্বচ্ছ ছিলেন, তাই মহান আল্লাহ্ তাঁকে পূর্ণতার আতরে সবচেয়ে বেশি সুরভিত করেছেন। আর সেই হৃদয় ও বক্ষ যা পূর্বাপর সবার অন্তর ও হৃদয়ের চেয়ে বেশি প্রশস্ত, পবিত্র, নিষ্পাপ এবং জ্যোতির্ময় ছিল, কেবল সেটিই এমন ওহী লাভের যোগ্য ছিল যা পূর্বাপর সবার ওহীর চেয়ে অধিক শক্তিশালী ও পূর্ণাঙ্গ হবে; [অর্থাৎ অনেক সুদৃঢ় এবং পূর্ণাঙ্গ হবে;] আর সুউচ্চ ও কামিল হয়ে ঐশী গুণাবলি পূর্ণরূপে প্রদর্শন করার জন্য (সেই হৃদয়) হবে এক অতীব স্বচ্ছ, বিশাল ও প্রশস্ত দর্পণস্বরূপ। এই দর্পণে আমরা আল্লাহ্ তা'লার গুণাবলিও দেখতে পাই এবং আল্লাহ্ তা'লার মহান সত্তার প্রতিটি দিকও আমরা মহানবী (সা.)-এর ব্যক্তিসত্তায় এবং তাঁর শিক্ষায় দেখতে পাই। এ কারণেই পবিত্র কুরআন এমন সব পরম শ্রেষ্ঠত্ব ধারণ করে, যার প্রখর জ্যোতি এবং তীব্রচ্ছটার সামনে পূর্বের সকল ঐশী গ্রন্থের ঔজ্জ্বল্য ম্লান হয়ে গেছে। [অর্থাৎ, পূর্বের সকল ঐশীগ্রন্থ এবং সেগুলোর বাণীর ঔজ্জ্বল্য এর (তথা কুরআনের) সামনে কোনো মূল্যই রাখে না।] কোনো মস্তিষ্ক এমন কোনো (নতুন) সত্য উদ্ভাবন করতে পারবে না যা আগে থেকেই এতে বিদ্যমান নেই। [পবিত্র কুরআনে সব কিছুই বিদ্যমান রয়েছে, আর পৃথিবীর মানুষ এমন কোনো কিছু উদ্ভাবন বা আবিষ্কার করতে পারবে না যা পবিত্র কুরআনে নেই; তবে তা অনুধাবন করার প্রয়োজন রয়েছে।] কারো মস্তিষ্ক

এমন কোনো যৌক্তিক দলিল উপস্থান করতে পারবে না যা পূর্বেই এটি (অর্থাৎ কুরআন) উপস্থাপন করে নি। যেভাবে লক্ষ লক্ষ হৃদয়ে এটি (কুরআন) শক্তিশালী ও কল্যাণকর প্রভাব সৃষ্টি করেছে অন্য কোনো বক্তব্য তদ্রূপ শক্তিশালী প্রভাব হৃদয়ে সৃষ্টি করতে পারবে না। তিনি (আ.) বলেন, নিঃসন্দেহে এটি আল্লাহ্ তা'লার সুমহান গুণাবলি প্রদর্শনের স্বচ্ছতম দর্পণ। তত্ত্বজ্ঞানের সুউচ্চ মানে উপনীত হবার জন্য একজন সত্যান্বেষীর যা যা প্রয়োজন, সেগুলো সবই এতে বিদ্যমান।

যে শিক্ষা মহানবী (সা.)-এর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তা এমন পবিত্র, যা ছিল সবকিছুর ঊর্ধ্বে, সব শিক্ষার ঊর্ধ্বে ছিল। সকল ঐশী গ্রন্থাবলির তুলনায় অনেক উন্নত, পূর্ণাঙ্গ ও উৎকৃষ্ট শিক্ষা হচ্ছে পবিত্র কুরআনের শিক্ষা। এ কারণেই তাঁর সত্তাও এ শিক্ষার ধারক। অর্থাৎ তিনিও হলেন কামিল ও পূর্ণতম। এটি তিনি (সা.) প্রমাণ করে দেখিয়েছেন। যে গ্রন্থ তাঁর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তা এ কারণেই হয়েছে যে, তাঁর সত্তা সকল মানবের চেয়ে পূর্ণ ছিল আর তিনিই সেই পূর্ণ মানব যাঁর মোকাম বা উচ্চতায় কেউ পৌঁছতে পারবে না। তবে আল্লাহ্ তা'লা একথাও বলেছেন, **তিনি তোমাদের জন্য আদর্শ, তাঁকে অনুসরণ করতে চেষ্টা করো**। এ কারণেই আল্লাহ্ তা'লা তাঁর মাধ্যমে এই ঘোষণাও করিয়েছেন যে, লোকদেরকে বলে দাও,

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

অর্থাৎ, "**তুমি বলে দাও, 'হে লোক সকল! তোমরা যদি আল্লাহ্কে ভালোবাসো তাহলে আমার অনুসরণ করো, এমতাবস্থায় তিনিও তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন; বস্তুত আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, বার বার কৃপাকারী'।**"

অতএব, আল্লাহ্ তা'লার ভালোবাসা লাভ করার রীতিও তাঁর আদর্শ থেকেই শিখতে হবে। আল্লাহ্ তা'লার প্রতি মহানবী (সা.)-এর ভালোবাসার যে দৃশ্য আমরা দেখতে পাই, হাদীসে সে সংক্রান্ত কিছু রেওয়ায়েত রয়েছে। মহানবী (সা.) তাঁর প্রভুর ভালোবাসা লাভের জন্য এই দোয়া করতেন:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ وَالْعَمَلَ الَّذِي يُبَلِّغُنِي حُبَّكَ. اللَّهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي وَأَهْلِي وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ

অর্থাৎ, হে আল্লাহ্। আমি তোমার নিকট তোমার ভালোবাসা যাচনা করি, আর তার ভালোবাসা চাই যে তোমাকে ভালোবাসে, আর এমন কাজের সামর্থ্য যাচনা করি যার মাধ্যমে তোমার ভালোবাসা লাভ হবে। হে আল্লাহ্! তোমার ভালোবাসাকে আমার কাছে আমার নিজ প্রাণ, পরিবার এবং সুশীতল পানির চেয়েও প্রিয়তর করে দাও।

এটি হচ্ছে সেই দোয়া যা এখন প্রত্যেক এমন ব্যক্তির করা উচিত যে মহানবী (সা.)-কে ভালোবাসার দাবি করে, আর যে আল্লাহ্ তা'লার প্রতি ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে চায়, আল্লাহ্ তা'লার প্রিয়প্রাত্র হতে চায় এবং আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি স্বীয় কৃপা বর্ষণ করবেন। একইভাবে আরেকটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন ইয়াযীদ খাতমী আনসারী (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) এই দোয়া করতেন, '**হে আল্লাহ্ আমাকে তোমার ভালোবাসা দান করো আর তার ভালোবাসা দান করো যার ভালোবাসা তোমার সন্নিধানে আমার জন্য লাভজনক হবে। হে আল্লাহ্! আমার প্রিয় বিষয়গুলো যা তুমি আমাকে দান করেছ, সেগুলোকে তোমার প্রিয় কাজগুলো করার সামর্থ্য লাভের জন্য আমার শক্তির**

উৎস বানিয়ে দাও। আর আমার প্রিয় যেসব জিনিস তুমি আমার থেকে পৃথক করে দাও, সেগুলোকে আমার জন্য তোমার পছন্দনীয় বিষয়সমূহ অর্জনের শক্তির উৎস বানিয়ে দাও।'

অতএব, মহানবী (সা.) এই দোয়া করেছেন, তোমার দেওয়া আমার পছন্দের জিনিসগুলোকে তোমার পছন্দের বিষয় অর্জনের জন্য আমার শক্তির মাধ্যম বানিয়ে দাও, অধিক শক্তি দান করো, আর আমি যেন সেসব বিষয় বেশি বেশি অর্জন করি যা তোমার প্রিয়। আর এর মাধ্যমে আমি তোমার অধিক ভালোবাসা অর্জনকারী হই, আর সেসব বিষয় অর্জন করতে পারি যা তোমার প্রিয়। তিনি (সা.) বলেন, যা আমার প্রিয় জিনিস, যেসব জিনিস বা যেসকল মানুষ আমার কাছে প্রিয় মনে হয়, কিন্তু তুমি যদি সেগুলোকে আমার কাছ থেকে পৃথক করে দাও– তাহলে তুমি সেসব জিনিসকে আমার জন্য সেই বিষয়গুলো অর্জনের ক্ষেত্রে শক্তির মাধ্যম বানিয়ে দাও যা তুমি পছন্দ করো। [যেসব জিনিস আমার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, সেগুলোর কারণে নিরাশ হওয়া উচিত নয়। বরং এরপর আমি যেন পুনরায় শক্তি লাভ করি। অর্থাৎ যেহেতু তা আল্লাহ্ তা'লার প্রিয় ছিল না এবং তিনি আমার থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছেন, অথবা এটিই আল্লাহ্ তা'লার অভিপ্রায় ছিল, এটিই তাঁর পছন্দ ছিল; তাই যেসব জিনিস আল্লাহ্ তা'লার প্রিয় তা যেন আমি লাভ করি। আল্লাহ্ তা'লা যদি আমার কাছ থেকে সেসব জিনিস নিয়ে নেন যা আল্লাহ্ তা'লার পছন্দ নয়, তাহলে হে আল্লাহ্! তোমার প্রিয় ও পছন্দীয় যেসব বিষয় রয়েছে– সেগুলো লাভ করার শক্তি আমাকে দান করো।] এটি ছিল তাঁর (সা.) আল্লাহ্ তা'লার প্রতি ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ।

অনুরূপভাবে হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, **إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ** (সূরা আন-নাসরঃ ০২) অবতীর্ণ হবার পর মহানবী (সা.) এমন কোনো নামায পড়েন নি যার মাঝে তিনি এটি পাঠ করেন নি: **سُبْحَانَكَ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْلِي** অর্থাৎ, হে আমাদের প্রভু! তোমার প্রশংসাসহ তুমি পবিত্র। হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে ক্ষমা করো।

আল্লাহ্ তা'লার প্রতি ভালোবাসার একটি ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, আমি এক রাতে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পাশে শুয়ে ছিলাম। রাতে আমি তাঁকে [নিজের পাশে] দেখতে পেলাম না। আমি রাতের অন্ধকারে তাঁকে খুঁজতে লাগলাম, তখন আমার হাত তাঁর চরণ স্পর্শ করল। তিনি সিজদাবনত অবস্থায় ছিলেন এবং আল্লাহ্ তা'লার নিকট এই দোয়া করছিলেন যে, **আমি তোমার অসন্তুষ্টি থেকে তোমার সন্তুষ্টির আশ্রয় চাই। আর তোমার শাস্তি থেকে তোমার ক্ষমার আশ্রয় চাই। আমি তোমার প্রশংসা গণনা করে শেষ করতে পারব না। তুমি ঠিক তেমনই, যেমনটি তুমি স্বয়ং নিজের প্রশংসা করেছ।** [অর্থাৎ, আমি তো তোমার সেই পরিমাণ প্রশংসা করার সামর্থ্য রাখি না; যা তুমি স্বয়ং নিজের সম্পর্কে বর্ণনা করেছ– সেটিই তোমার প্রকৃত প্রশংসা।]

অনুরূপভাবে হযরত আয়েশা (রা.) এক জায়গায় বলেন, এক রাতে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর আমার ঘরে থাকার পালা ছিল। আমি ঘুমিয়ে পড়লে তিনি নিঃশব্দে বাইরে চলে যান। আমি ধারণা করলাম, সম্ভবত তিনি অন্য কোনো স্ত্রীর ঘরে গিয়েছেন। আমি ঈর্ষাবশত বাইরে বের হলাম; তখন দেখতে পেলাম, তিনি এক টুকরো কাপড়ের পুঁটুলির ন্যায় মাটিতে সিজদায় পড়ে আছেন। আমি তাঁকে বলতে শুনলাম: **سَجَدَ لَكَ سَوَادِي وَخَيَالِي وَآمَنَ بِكَ فُؤَادِي رَبِّ هَذِهِ يَدِي وَمَا جَنَيْتُ عَلَى نَفْسِي يَا عَظِيمُ تُرْجَى لِكُلِّ عَظِيمٍ فَاغْفِرِ الذَّنْبَ الْعَظِيمَ** অর্থাৎ, **হে আল্লাহ্! তোমার জন্য আমার দেহ ও মন সিজদাবনত, আমার অন্তর তোমার প্রতি ঈমান এনেছে। হে আমার প্রভু! আমার এই দুই হাত তোমার সামনে প্রসারিত আর আমি উভয় হাতে নিজ প্রাণের প্রতি যে অবিচার**

করেছি তা-ও তোমার সামনে রয়েছে। [অথচ মহানবী (সা.) তো এমন একজন পূর্ণাঙ্গ মানুষ ছিলেন যাঁর মধ্যে পুণ্য ব্যতীত আর কিছুই দেখা যায় না; কিন্তু তিনিও এটি বলছেন যে, আমি নিজ প্রাণের প্রতি যে যুলুম করেছি তা তোমার সামনে রয়েছে।] **হে সুমহান সত্তা, যাঁর নিকট বড়ো থেকে বড়ো বিষয়ের প্রত্যাশা করা হয়। তুমি সমস্ত বড়ো পাপ ক্ষমা করে দাও।**

হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, এরপর তিনি (সা.) নিজের পবিত্র শির তুললে আমাকে দেখতে পান। তিনি জিজ্ঞেস করেন, কোন জিনিস তোমাকে বাইরে নিয়ে এল? তুমি কেন বাইরে চলে এলে? তুমি তো ঘুমিয়ে ছিলে। তিনি নিবেদন করেন, আমি ধারণার বশবর্তী হয়ে এমনটি করেছি। অর্থাৎ আমার মনে হয়েছিল, আপনি সম্ভবত অন্য কোনো স্ত্রীর ঘরে গিয়েছেন। তিনি (সা.) বলেন, নিশ্চয়ই কোনো কোনো ধারণা পাপে পরিণত হয়। তুমি কি আমার প্রতি সন্দেহ করলে? এটি তো পাপ। [যেমনটি হযরত আয়েশা (রা.) বলেছিলেন, তিনি সন্দেহ করেছিলেন যে, হয়ত অন্য কোনো স্ত্রীর ঘরে চলে গিয়েছেন– সেটিই তিনি জানান। তিনি (সা.) বলেন, এই যে কুধারণা– এগুলো পাপে পর্যবসিত হয়।] আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো। অতএব, কুধারণা থেকে বাঁচার জন্য প্রতিটি বিষয়ে আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা তথা ইস্তিগফার করা অত্যন্ত জরুরি। এরপর তিনি (সা.) হযরত আয়েশাকে বলেন, ব্যাপার হলো, জিবরাঈল (আ.) আমার কাছে এসেছিলেন এবং তিনি আমাকে এই শব্দগুলো পড়ার জন্য বলেছিলেন; তাই তুমিও তোমার সিজদায় এগুলো পাঠ কোরো। [এখন যেহেতু তুমি শুনে নিয়েছ, তাই এগুলো পাঠ কোরো।] যে ব্যক্তি এই বাক্যগুলো পাঠ করবে, সে সিজদা থেকে মাথা তোলার পূর্বেই ক্ষমাপ্রাপ্ত হবে। হ্যাঁ, সাথে এই শর্তও রয়েছে যে, তাকে পূর্ণরূপে আল্লাহ্ তা'লার ওপর ঈমান আনয়নকারীও হতে হবে, বিশ্বাসও পূর্ণ হতে হবে এবং অন্যান্য পুণ্যকর্ম সম্পাদনকারীও হতে হবে। মহানবী (সা.) হযরত আয়েশা (রা.)-কে তো এটিই বলেছেন, কারণ তিনি জানতেন যে, হযরত আয়েশার মান কেমন। কিন্তু কেউ অন্যান্য পুণ্যকর্ম সম্পাদন না করে কেবল এই দোয়াটি পড়ে নিলেই ক্ষমা পেয়ে যাবে– বিষয়টি এমন নয়!

অনুরূপভাবে অন্য এক রেওয়ায়েতে রয়েছে যা আরো বিস্তারিতভাবে সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, একরাতে আমার ঘরের পালায় মহানবী (সা.) ঘরে আসেন, নিজের চাদর রাখেন, জুতো খোলেন এবং নিজের পায়ের কাছে রাখেন। এরপর নিজের গায়ের চাদরের এক প্রান্ত বিছানায় বিছিয়ে শুয়ে পড়েন। কিছুক্ষণ পর তিনি যখন ভাবলেন যে, আমি ঘুমিয়ে পড়েছি, তখন তিনি ধীরে ধীরে নিজের চাদর নেন, ধীরে ধীরে নিজের জুতো পরেন, দরজা খোলেন এবং বাইরে চলে যান, এরপর অত্যন্ত সাবধানে দরজাটি বন্ধ করে দেন। আমি আমার ওড়না ও গায়ের চাদর পরে তাঁর (সা.) পিছু নিই। একপর্যায়ে তিনি জান্নাতুল বাকী-তে পৌঁছে যান। তিনি সেখানে নামাযে দাঁড়ান এবং দীর্ঘ কিয়াম করেন। এরপর তিনি তিনবার দুই হাত তোলেন। অতঃপর তিনি ফিরে আসার জন্য ঘুরে দাঁড়ান এবং আমিও ঘুরে দাঁড়াই। তিনি দ্রুত হাঁটেন আর আমিও দ্রুত হাঁটতে থাকি। তিনি গতি আরো বাড়িয়ে দেন, আমিও গতি বৃদ্ধি করি। তিনি আরো দ্রুত চলতে থাকেন, আমিও দ্রুত চলতে থাকি। এরপর তিনি ঘরে আসেন এবং আমি তাঁর আগেই ঘরে প্রবেশ করে শুয়ে পড়ি। তিনি (সা.) যখন ভেতরে আসেন তখন বলেন, হে আয়েশা! তোমার কী হয়েছে? তোমার নিশ্বাস এত দ্রুত ওঠা-নামা করছে কেন? [দ্রুত হাঁটার কারণে তিনি দ্রুত নিশ্বাস ফেলছিলেন। মহানবী (সা.) তা শুনতে পান এবং অনুভব করেন যে, তিনি (রা.) দ্রুত নিশ্বাস নিচ্ছিলেন।] হযরত আয়েশা বলেন, দ্রুত হাঁটার কারণে আমার নিশ্বাসের গতি বেড়ে যায়; কিন্তু আমি বললাম,

কিছু হয় নি এবং বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলাম। তিনি (সা.) বলেন, তুমি অবশ্যই আমাকে বলবে, অন্যথায় সূক্ষ্মদর্শী ও সর্বজ্ঞ আল্লাহ্ আমাকে বলে দেবেন। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আমার পিতামাতা আপনার জন্য উৎসর্গিত। এরপর আমি আমার মনে কী চিন্তা এসেছিল এবং আমি কীভাবে তাঁর পেছনে গিয়েছিলাম– সব কথা খুলে বললাম। তিনি (সা.) বলেন, আচ্ছা, তাহলে সেই ছায়াটি তুমিই ছিলে যাকে আমি আমার সামনে দেখেছিলাম? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি আমার বুকে মৃদু আঘাত করেন যা আমি অনুভব করলাম এবং বলেন, তুমি কি ভেবেছিলে যে, আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল তোমার অধিকার পদদলিত করবেন? হযরত আয়েশা বলেন, মানুষ যা কিছু গোপন করে আল্লাহ্ তা জানেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'লা তো জানেনই, আর তিনি তা প্রকাশ করে দিতেন; তাই আমিই বলে দিয়েছি। অর্থাৎ আমার হৃদয়ে যা ছিল তা আমি জানিয়ে দিয়েছি। রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, জিবরাঈল আমার নিকট এসেছিলেন এবং তুমি যখন আমাকে বাইরে যেতে দেখেছ তখন তিনি আমাকে ডেকেছিলেন। যেহেতু তিনি তোমার নিকট বিষয়টি গোপন রেখেছিলেন, তাই আমি তাঁর কথা গ্রহণ করেছি এবং তোমার নিকট বিষয়টি গোপন রেখেছি। এই কারণেই আমি তোমাকে বলি নি এবং তাঁর সাথে চলে গিয়েছি। আমার ধারণা ছিল, তুমি ঘুমিয়ে পড়েছ এবং আমি তোমাকে জাগানো পছন্দ করি নি। তিনি বলেন, তোমাকে বলে যাবার ক্ষেত্রে আমার আশঙ্কা হয়েছিল, তুমি একাকীত্ব বোধ করবে; তুমি হয়ত বলতে, আজ আমি একা। জিবরাঈল (আ.) মহানবী (সা.)-কে বলেছিলেন, আপনার প্রভু আপনাকে নির্দেশ দিচ্ছেন যেন আপনি বাকী-র অধিবাসীদের নিকট যান এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, আমি নিবেদন করি, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আমিও কি এই সওয়াবের অংশ পেতে পারি? আমি তাদের জন্য কীভাবে দোয়া করব? আপনি তো দোয়া করেছেন, এখন আমিও তো সেখান থেকে হয়ে এসেছি; আমি কী দোয়া করব? তিনি (সা.) বলেন, তুমি বলো, 'মু'মিন ও মুসলমানদের মধ্য থেকে এই গৃহবাসীদের ওপর সালাম এবং আল্লাহ্ তা'লা আমাদের মধ্য থেকে অগ্রগামীদের প্রতি এবং পরবর্তীদের প্রতি অনুগ্রহ করুন। আর আল্লাহ্ যদি চান তবে আমরাও তোমাদের সাথে মিলিত হব।' তিনি (সা.) এই দোয়াটিও শিখিয়ে দেন।

একইভাবে মহানবী (সা.)-এর আল্লাহ্ তা'লার প্রতি ভালোবাসার বিষয়ে একটি রেওয়ায়েত এভাবে বর্ণিত হয়েছে: আতা বর্ণনা করেন যে, আমি, হযরত আবদুল্লাহ্ বিন উমর (রা.) এবং উবায়েদ বিন উমায়ের (রা.) হযরত আয়েশা (রা.)-র কাছে উপস্থিত হই। হযরত ইবনে উমর (রা.) নিবেদন করেন, মহানবী (সা.)-এর জীবনের সবচেয়ে প্রিয় ও বিরল যে বিষয়টি আপনি দেখেছেন তা আমাদের বলুন। বর্ণনাকারী বলেন, এ কথা শুনে হযরত আয়েশা (রা.) কেঁদে ফেলেন। অতঃপর তিনি বলেন, তাঁর প্রতিটি বিষয়ই ছিল অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও বিস্ময়কর। অতঃপর হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, একরাতে তিনি (সা.) আমার পালায় আমার কাছে আসেন। যখন তিনি আমার সাথে লেপের নীচে প্রবেশ করেন এবং তাঁর শরীর আমার শরীর স্পর্শ করে তখন তিনি (সা.) বলেন, হে আয়েশা! তুমি যদি আমাকে অনুমতি দাও তবে আজ আমি রাতের বাকি অংশটুকু আমার প্রভুর ইবাদত করতে চাই। আমি বললাম, আমার কাছে আপনার সান্নিধ্য এবং আপনার ইচ্ছা উভয়টিই প্রিয়। আমি আপনার নৈকট্যকেও যেমন ভালোবাসি, তেমনই আপনার ইচ্ছারও সম্মান করি। আপনার সকল ইচ্ছা পূর্ণ হোক– এটিই আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় বিষয় । ঠিক আছে, আপনি যদি ইবাদত করতে চান তবে করুন। এরপর তিনি (সা.) ঘরে রাখা একটি মশকের

দিকে এগিয়ে যান এবং ওযু করেন। তিনি খুব বেশি পানি ব্যবহার করেন নি। এরপর তিনি নামাযে দাঁড়ান এবং কুরআন পাঠ আরম্ভ করেন ও কাঁদতে থাকেন। এমনকি আমি দেখলাম, তাঁর অশ্রু তাঁর কাপড়ের কিনারা পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। এরপর তিনি তাঁর ডান দিকে হেলান দেন এবং ডান হাত গালের নীচে রাখেন আর পুনরায় কাঁদতে থাকেন। এমনকি আমি দেখলাম তাঁর অশ্রু মাটি পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, অতঃপর ফজরের নামাযের সময় হলে হযরত বেলাল (রা.) তাঁকে নামাযের জন্য ডাকতে আসেন। যখন তিনি তাঁকে (সা.) কাঁদতে দেখেন তখন নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি কাঁদছেন? অথচ আল্লাহ্ তা'আলা আপনার পূর্বাপর সকল ত্রুটিবিচ্যুতি ক্ষমা করে দিয়েছেন! তিনি (সা.) বলেন, আমি কি একজন কৃতজ্ঞ বান্দা হবো না? কৃতজ্ঞতার একটি ঘটনা আমি গত খুতবাতেও বর্ণনা করেছিলাম; এটি সেটিরই অধিকতর বিস্তারিত বর্ণনা।

অন্য একটি রেওয়ায়েতে আছে, হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, যখন তিনি (সা.) মেঘ অথবা ঝড়ো হাওয়া দেখতেন, তখন তাঁর পবিত্র চেহারায় চিন্তার ছাপ ফুটে উঠত। হযরত আয়েশা (রা.) নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! মানুষ যখন মেঘ দেখে তখন এই আশায় আনন্দিত হয় যে, এতে বৃষ্টি হবে। কিন্তু আমি দেখি যে, আপনি যখনই মেঘ দেখেন তখন আপনার চেহারায় দুশ্চিন্তা প্রকাশ পায়। তিনি (সা.) বলেন, হে আয়েশা! কোন বিষয়টি আমাকে আশ্বস্ত করবে যে, এ ঝড়ো হাওয়ায় আযাব নিহিত নেই? আমি তো অদৃশ্যের জ্ঞান রাখি না। এখন কোন বিষয়টি আমাকে আশ্বস্ত করবে যে, এতে সেই ঝড়ো হাওয়ার আযাব নেই যা পূর্ববর্তী জাতিগুলোর ওপর এসেছিল? একটি জাতির ওপর আযাব এসেছিল, তারা যখন সেই আযাবকে (মেঘ আকারে) দেখেছিল তখন বলেছিল, এটি এমন মেঘ যা আমাদের ওপর বৃষ্টি বর্ষণ করবে, যেমনটি কুরআন শরীফেও এর উল্লেখ রয়েছে। তাই আমি জানি না– এতে কী আছে আর কী নেই। এই কারণে আল্লাহ্ তা'লার ভয় এবং তাঁর জন্য হৃদয়ে লালিত ভালোবাসার কারণে আমি ভীতত্রস্ত হয়ে পড়ি।

অন্য এক স্থানে হযরত আয়েশা (রা.) এই রেওয়ায়েতটি এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, মহানবী (সা.) যখন আকাশে মেঘ দেখতেন তখন অস্থির হয়ে ঘরের ভেতরে-বাইরে যাওয়া-আসা করতেন এবং তাঁর চেহারার রং বদলে যেত। আর যখন বৃষ্টি শুরু হতো তখন তাঁর অস্থিরতা দূর হয়ে যেত, অর্থাৎ স্বাভাবিকভাবে যখন বৃষ্টি বর্ষিত হতো– তখন। হযরত আয়েশা (রা.) তাঁকে এই অবস্থার কারণ জিজ্ঞেস করলে মহানবী (সা.) বলেন, যেমনটি 'আদ' জাতি বলেছিল– এটি সেরকম মেঘ কি না, তা আমি জানি না। সূরা আল-আহকাফের আয়াত অনুযায়ী যারা মেঘকে তাদের উপত্যকার দিকে আসতে দেখে বলেছিল, এই মেঘ আমাদের ওপর বৃষ্টি বর্ষণ করবে; অথচ তা তাদের জন্য আযাব নিয়ে এসেছিল।

অতঃপর রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) এবং তাঁর সাহাবীগণ মেঘ থেকে বর্ষিত প্রথম বৃষ্টির ফোঁটা গ্রহণ করার জন্য নিজেদের মাথা খালি করে দিতেন। রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলতেন: এটি আমাদের মহান প্রভুর পক্ষ থেকে আগত এক তাজা নিয়ামত এবং এটি অত্যন্ত বরকতময়। সাধারণ বৃষ্টি বর্ষণের ক্ষেত্রে এটিও তাঁর রীতি ছিল। উরওয়া বিন যুবায়ের (রা.)-র একটি রেওয়াত রয়েছে, তিনি বলেন, আমি হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমর ইবনুল আস (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলাম, মুশরিকদের পক্ষ থেকে মহানবী (সা.)-কে দেওয়া সবচেয়ে নির্মম আচরণ কী ছিল– তা আমাকে বলুন? তিনি বলেন, একবার মহানবী (সা.) কা'বার হাতিমে নামায পড়ছিলেন, এমন সময় উকবা বিন আবি মুঈত আসে এবং সে নিজের কাপড় তাঁর (সা.) গলায় পেঁচিয়ে তাঁর গলায় হ্যাঁচকা টান দেওয়া শুরু

করে। এরই মাঝে হযরত আবু বকর (রা.) পৌঁছে গেলেন এবং তিনি উকবাকে ধাক্কা দেন এবং মহানবী (সা.) থেকে সরিয়ে দেন। তিনি (রা.) বলেন, তোমরা কি এমন ব্যক্তিকে হত্যা করছ যিনি বলেন– ‘আল্লাহ্ আমার প্রভু’। তিনি তো কেবল আল্লাহ্র ভালোবাসায় বিলীন এবং তাঁর ইবাদত করছেন, অথচ তোমরা তাকে হত্যা করতে উদ্যত! মহানবী (সা.)-এর পুরো জীবন আল্লাহ্র ভালোবাসায় বিলীন ছিল। আল্লাহ্র প্রতি ভালোবাসার এমন দৃশ্য দেখে মক্কার লোকেরা এটাই বলত– إِنَّ محمّدًا عَشِقَ رَبَّهُ– অর্থাৎ, মুহাম্মদ (সা.) নিজ প্রভুর প্রেমে পড়েছে।

হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) এক সত্তার প্রেমে পাগলপারা হয়ে গিয়েছিলেন এবং এরপর তা লাভ করেছেন যা পৃথিবীতে কখনো কেউ পায় নি। আল্লাহ্ তা'লার প্রতি তাঁর ভালোবাসা এত বেশি ছিল যে, সাধারণ মানুষজনও বলত, عَشِقَ محمّدٌ علی ربِّهٖ– অর্থাৎ, মুহাম্মদ (সা.) নিজ প্রভুর প্রেমে পড়েছে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) অপর এক স্থানে বলেন, সাহাবা (রাযিআল্লাহু আনহুম) সেই সত্যবাদী পুরুষের চেহারা দেখেছিলেন, যাঁর আল্লাহ্র প্রেমিক হবার সাক্ষ্য অবলীলায় কুরাইশের কাফিরদের মুখ থেকে বের হয়েছিল; দৈনন্দিন ইবাদত ও প্রেমময় সিজদা এবং আনুগত্যে বিলীনতা, পরম ভালোবাসা ও প্রেমের উজ্জ্বল ছাপ চেহারায় প্রত্যক্ষ করে এবং সেই পবিত্র চেহারার ওপর ঐশী জ্যোতি বর্ষিত হওয়া প্রত্যক্ষ করে তারা বলত, عَشِقَ محمّدٌ علی ربِّهٖ– অর্থাৎ, মুহাম্মদ (সা.) নিজ প্রভুর প্রেমে পড়েছে। অতঃপর সাহাবীরা শুধু সেই সততা, ভালোবাসা ও নিষ্ঠাই দেখেন নি, বরং আমাদের নেতা মুহাম্মদ (সা.)-এর হৃদয় থেকে নদীর ন্যায় প্রবাহমান সেই ভালোবাসার বিপরীতে আল্লাহ্ তা'লার ভালোবাসাকেও অসাধারণ সমর্থনরূপে প্রত্যক্ষ করেছেন। তখন তারা জানতে পারেন যে, আল্লাহ্ আছেন; আর তাদের হৃদয় বলে ওঠে, সেই আল্লাহ্ এই মহান ব্যক্তির সাথে আছেন। তারা এত বিপুল পরিমাণে ঐশী বিস্ময়কর ঘটনাবলি প্রত্যক্ষ করেছেন এবং এত পরিমাণে ঐশী নিদর্শন প্রত্যক্ষ করেছেন যে, তাদের এই ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহ অবশিষ্ট থাকে নি যে, প্রকৃতপক্ষে একজন মহান সত্তা বিদ্যমান রয়েছেন যাঁর নাম আল্লাহ্, যাঁর নিয়ন্ত্রণে রয়েছে প্রতিটি বিষয়, আর যাঁর জন্য অসম্ভব বলে কিছু নেই। এজন্যই তারা সততা ও নিষ্ঠার সেই কাজ করেছেন এবং সেরকম রক্ত পানি করা পরিশ্রম করেছেন যা কখনো মানুষের জন্য করা সম্ভব নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত তার সমস্ত সন্দেহ ও সংশয় দূর হয়ে না যায়। তারা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছেন যে, মানুষ যদি ইসলাম ধর্মে প্রবেশ করে এবং তাঁর পবিত্র রসূলকে (সা.) মনেপ্রাণে অনুসরণ করে, তবে এতেই সেই পবিত্র সত্তা সন্তুষ্ট হন। এই পরিপূর্ণ বিশ্বাস অর্জনের পর তারা আনুগত্যের যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন এবং আনুগত্যের যে আবেগ নিয়ে তারা কাজ করেছেন এবং যেভাবে নিজেদের প্রাণ তাদের মহান পথপ্রদর্শকের সম্মুখে উপস্থাপন করেছেন– অভিজ্ঞতা না হওয়া পর্যন্ত তেমনটি করা সম্ভব নয়।

হযরত আলী (রা.)-র বর্ণনা করেন, আমি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে তাঁর (জীবন) পদ্ধতির ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম, আপনার পদ্ধতি কী? তিনি (সা.) বলেন, আমার মূলধন হলো মা'রেফত। অর্থাৎ, আপনার জীবনের মূলমন্ত্র কী? তিনি (সা.) বলেন, মা'রেফত (তথা তত্ত্বজ্ঞান) হলো আমার মূলধন আর বিবেকবুদ্ধি আমার ধর্মের মূল। [আল্লাহ্ তা'লা আমাকে মা'রেফত দান করেছেন, এটি আমার মূলধন এবং আমার সম্পদ। আল্লাহ্ তা'লা আমাকে বিবেকবুদ্ধি দিয়েছেন আর আমি তা আল্লাহ্ তা'লার ভালোবাসায় ব্যবহার করি এবং তাঁর

নির্দেশিত মূলনীতির ওপর পরিচালিত হয়ে ব্যবহার করি।] এটি আমার ধর্মের মূল ও ভিত্তি, এবং আল্লাহ্ তা'লার ভালোবাসাই আমার জীবনের মূলধন ভিত্তি। আল্লাহ্‌র পথে অগ্রগামী হবার উদ্দীপনা আমার বাহন। [আল্লাহ্‌র রাস্তায় এবং তাঁর ভালোবাসায় ক্রমাগত উন্নতি লাভের আগ্রহই হলো আমার বাহন; এতে আরোহণ করে আমি ক্রমাগত উন্নতি করে চলেছি এবং চেষ্টাপ্রচেষ্টা করে যাচ্ছি।] আর আল্লাহ্ তা'লার যিকর আমার বন্ধু ও সমব্যথী। [কে আমার বন্ধু? কে আমার সহমর্মী আর আমাকে সান্ত্বনাদাতা? তা কেবলমাত্র আল্লাহ্ তা'লার স্মরণ, তাঁর যিকর এবং দোয়া।] আল্লাহ্‌র ওপর আস্থা আমার ধনভাণ্ডার। [আমি কেবল তাঁর প্রতিই আস্থা এবং ভরসা করি আর এটিই আমার ধনভাণ্ডার।] তুমি যেহেতু আমার পদ্ধতি সম্বন্ধে জানতে চাইছ তাই স্মরণ রেখো! দুঃখকষ্ট আমার জীবনসঙ্গী। [আমি যদি কোনো দুঃখ বা কষ্ট পাই তবে তা আমার সাথি এবং জীবনের অংশ, আমি এসবের কোনো পরোয়া করি না। কেননা আল্লাহ্ তা'লা আমার সাথেই আছেন।] অতঃপর তিনি (সা.) বলেন, জ্ঞান হলো আমার অস্ত্র। আল্লাহ্ তা'লা জ্ঞানার্জনের নির্দেশ দিয়েছেন, কেননা জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে মেধা প্রখর হয় এবং আল্লাহ্ তা'লার তত্ত্বজ্ঞান (মা'রেফত) অধিক অর্জিত হয় আর আমাকে আল্লাহ্ তা'লা জ্ঞান শেখান; আর আল্লাহ্‌প্রদত্ত জ্ঞানের চেয়ে বড়ো অস্ত্র আর কী হতে পারে! তিনি (সা.) বলেন, এটিই আমার অস্ত্র যার সাহায্যে আমি উন্নতি করছি। [জাগতিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে আপনারা লক্ষ্য করেছেন, যেমনটি আমি ইতোপূর্বে খুতবাসমূহে যুদ্ধের ঘটনাবলি বর্ণনা করেছি; আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে অভাবনীয়ভাবে জ্ঞান দান করেছেন যার ফলশ্রুতিতে তিনি (সা.) সর্বোত্তম রণকৌশল ও পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পেরেছেন। অনুরূপভাবে, অসংখ্য আধ্যাত্মিক জ্ঞানেও তিনি (সা.) পরিপূর্ণ ছিলেন যার কোনো অন্ত নেই। আর এই বিষয়টি সবার জানা, সবার সামনেই স্পষ্ট।] অতঃপর তিনি (সা.) বলেন, ধৈর্য হলো আমার চাদর। [অর্থাৎ, আমার চাদর ও পোশাক হলো ধৈর্য।] আর আমার মালে গনিমত হলো আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট থাকা। [আমি আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় সন্তুষ্ট আর এটাই আমার মালে গনিমত।] দারিদ্র্য আমার গর্ব আর বাহ্যিক দারিদ্র্য বা আর্থিক অসচ্ছলতাই হলো আমার অহংকার। [দরিদ্রতা সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'লা আমাকে অগণিত কল্যাণ দান করার কারণে আমি গর্ববোধ করি।] সংসারবিরাগ ও খোদাভীতি হলো আমার কৌশল আর আমি এটিই আত্মস্থ করার চেষ্টা করি। বিশ্বাস হলো আমার শক্তি। [আল্লাহ্ তা'লার ওপর আমার পরিপূর্ণ বিশ্বাস রয়েছে আর এটিই আমার শক্তির উৎস।] সত্যবাদিতা আমার সুপারিশকারী, আমি কখনো মিথ্যা কথা বলি নি, আর সত্যবাদিতা আমার জন্য সুপারিশের মাধ্যম। আনুগত্য আমার জন্য যথেষ্ট। আমি আল্লাহ্ তা'লার সকল আদেশ পরিপূর্ণরূপে আনুগত্যের সাথে পালনকারী। জিহাদ করা আমার আদর্শ; [দৈহিক জিহাদ হোক বা আল্লাহ্ তা'লার পথে আধ্যাত্মিক জিহাদ হোক অথবা আল্লাহ্‌র সৃষ্টজীবের অধিকার প্রদানের জিহাদ হোক– এটিই আমার আদর্শ;] নামায হলো আমার চোখের স্নিগ্ধতা। [এ সবকিছু লাভ করা সত্ত্বেও আমার চোখের প্রকৃত স্নিগ্ধতা হলো নামায। আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য অর্জন করতে হবে, তাঁর ইবাদত করতে হবে, তাঁর প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করতে হবে।] অপর একটি হাদীসানুসারে তিনি (সা.) বলেছেন, আমার অন্তরের (সুমিষ্ট) ফল হলো আল্লাহ্‌র স্মরণ আর আমার আকাঙ্ক্ষা ও অভিষ্ট আমার প্রভুর মাঝেই সীমাবদ্ধ।

সুতরাং মহানবী (সা.)-এর জীবনাদর্শ এবং আল্লাহ্ তা'লার প্রতি তাঁর ভালোবাসার দৃষ্টান্ত এমনই ছিল যার কতিপয় দৃষ্টান্ত আমি উপস্থাপন করেছি। এই দৃষ্টান্তের কল্যাণেই সাহাবীদের মাঝে একটি বিপ্লব সৃষ্টি হয়েছিল আর তারা সেই পদমর্যাদা লাভ করেছেন যার

ধারণাও ইতোপূর্বে করা সম্ভব ছিল না; যেমনটি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, যা আমি আগেও পড়েছিলাম। এটাই সেই পূর্ণাঙ্গীন-পরিপূর্ণ শিক্ষা, যা তাঁর একনিষ্ঠ দাস হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) নিজেও গ্রহণ করেছিলেন। তিনি (আ.) এক স্থানে বলেন, আল্লাহ্ তা'লা তাঁকেও মহানবী (সা.)-এর পরিপূর্ণ অনুসরণের ফলেই এ নিয়ামত দান করেছেন। তিনি (আ.) বলেন, আমাকে স্বপ্নে দুবার পাঞ্জাবী ভাষায় দুটি পঙ্‌ক্তি বলা হয়েছে। একটিতে বলা হয়েছে,

جے تو میرا ہو رہیں، سب جگ تیرا ہو

[অর্থাৎ, তুমি যদি আমার হও তবে সমগ্র জগৎ তোমার হয়ে যাবে। (অনুবাদক)] আরেকবার আমি দেখি, একটি বিস্তৃত ময়দান। সেখানে একজন 'মজযুব' (তথা যার অন্তর আল্লাহ্‌র ভালোবাসার উন্মাদনায় পরিপূর্ণ) আমার দিকে এগিয়ে আসছে। আমি তার নিকটবর্তী হলে সে এই পঙ্‌ক্তি পাঠ করল,

عشق الٰہی منہ پر وسے، ولیاں اے نشانی

অর্থাৎ, অলিদের পরিচয় হলো, তাদের মুখমণ্ডলে আল্লাহ্‌র ভালোবাসার দৃশ্যমান হয়ে থাকে। এর অর্থ ছিল, সে আমাকে দেখে একথা বলেছিল, কারণ সে (আমার মাঝে) খোদাপ্রেম দেখেছিল, নূর দেখেছিল।

তিনি (আ.) এক স্থানে এ-ও বলেন, আমি যা কিছু অর্জন করেছি তা সবই মহানবী (সা.)-এর অনুসরণের ফলেই লাভ হয়েছে। এটাই ছিল তাঁর আদর্শ আর এ কারণেই তিনি জামা'ত প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আজ আমরা যে দাবি করি– আমরা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রকৃত অনুসারী, আর আমরাই তাঁর (সা.) একনিষ্ঠ সেবক হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করে এই অঙ্গীকার নবায়ন করেছি যে, ভবিষ্যতে আমরা আমাদের জীবন আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশাবলি অনুযায়ী গড়ে তোলার চেষ্টা করব। তাই আমাদেরও এদিকে মনোযোগ দিতে হবে যে, আমাদের প্রতিটি কাজ কেবল আল্লাহ্ তা'লার জন্যই করতে হবে এবং তাঁর ভালোবাসা অর্জনের লক্ষ্যে আরো বেশি সচেষ্ট হতে হবে। আমরা যখন এভাবে আমল করতে সক্ষম হবো, তখনই কেবল আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহের ভাগীদার হতে পারব, মহানবী (সা.)-এর সত্যিকার উম্মত হবার প্রকৃত দায়িত্ব পালনে সক্ষম হবো, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আতের কারণে যে দায়িত্ব বর্তায় তা পালন করতে পারব এবং তাঁর সত্যিকার অনুসারীদের মধ্যে পরিগণ্য হবো। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের এ তৌফিক দান করুন।

বর্তমানে পাকিস্তানের আহমদীদের জন্য বিশেষভাবে দোয়া করুন। সেখানে মুবারক সানী সাহেবের বিরুদ্ধে একটি মামলা চলমান রয়েছে; দুদিন পূর্বে সেশন জজ তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছে। অভিযোগ হলো, তার কাছে পবিত্র কুরআন ছিল; তিনি তা পড়তেন এবং অন্যদেরও পড়াতেন। এটা হলো সেখানকার আদালতগুলোর অবস্থা! তাদের অবস্থার আর কী-ইবা উন্নতি আশা করা যায়! এই রায়ের বিষয়ে তো অআহমদীরাও লিখেছে, এটা কেমন হাস্যকর রায়! অবশ্য কিছু মোল্লা-মৌলভীর পক্ষ থেকে সাধারণভাবে এই রায়কে সাধুবাদও জানানো হচ্ছে এবং বিচারকের খুব প্রশংসা করা হচ্ছে। কিন্তু ন্যায়পরায়ণ লেখকেরা লিখেছেন, আর তাদের কেউ কেউ বিদ্রূপাত্মক সুরেই লিখেছেন– এত বড়ো অপরাধ! বাড়িতে পবিত্র কুরআন রেখেছে আর সেটা পড়ে এবং শিশুদেরও পড়ায়! এটা হলো তথাকথিত এসব আলেম ও তাদের সাঙ্গপাঙ্গদের অবস্থা। সরকার ও প্রশাসনও এসব

মোল্লাদের পেছনে চলে কিছু কিছু স্থানে এমনটাই করছে। যাহোক, আমরা দোয়া করি– আল্লাহ্ তা'লা যেন অচিরেই তাদের পাকড়াও করার ব্যবস্থা করেন। আল্লাহ্ তা'লার শাস্তি শীঘ্রই তাদের ধৃত করবে, ইনশাআল্লাহ্, আর এর লক্ষণও দেখা যাচ্ছে। তবে আমাদের দোয়ায় শৈথিল্য বা কর্ম ও যথাযথভাবে ইবাদত না করার কারণে যেন এতে বিলম্ব না ঘটে– এ নিয়ে আমাদের সতর্ক থাকা উচিত; যেভাবে মহানবী (সা.)-ও কখনো কখনো মেঘ দেখলে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে দোয়া করতেন। সুতরাং দোয়ার প্রতি খুব বেশি মনোযোগ নিবদ্ধ করা প্রয়োজন। একইসাথে বিশ্বের অন্যান্য নির্যাতিত মানুষের জন্যও দোয়া করুন। আল্লাহ্ তা'লা সর্বত্র সবাইকে নিরাপত্তা দান করুন এবং সব ধরনের নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা থেকে রক্ষা করুন।

নামাযের পর আমি দুই ব্যক্তির গায়েবানা জানাযা পড়াবো। দুইজনের স্মৃতিচারণ রয়েছে। প্রথমজন হলেন মওলানা জালালুদ্দীন নাইয়ার সাহেব। তিনি কাদিয়ানের সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়া এবং সদর মজলিস তাহরীকে জাদীদের প্রাক্তন সদর ছিলেন। সম্প্রতি তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। তার পিতা শ্রদ্ধেয় এইচ. হুসাইন সাহেব বিশ্বযুদ্ধের সময় সেনাবাহিনীতে ক্লার্ক হিসেবে চাকরি করতেন। সেই সময় বসরাতে ১৯২২ সালে আহমদীয়াত গ্রহণ করেন এবং কেরালা থেকে প্রকাশিত জামা'তী পত্রিকা 'সাত্তিয়া দোতান'-এর সম্পাদক নিযুক্ত হন। তিনি কেরালার অধিবাসী ছিলেন। সেনাবাহিনীর চাকরি শেষে সেখানে ফিরে আসেন। মরহুমের পিতা শ্রদ্ধেয় এইচ. হুসাইন সাহেব ১৯৫০ সালে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-র কাদিয়ানে বসতি গড়ার ডাকে সাড়া দিয়ে পুরো পরিবারসহ স্থায়ীভাবে কাদিয়ান এসে যান। তবে বছরখানেকের মাঝে তার মৃত্যু হয়। মওলানা জালালুদ্দীন নাইয়ার সাহেবের মাতা শ্রদ্ধেয়া যুবায়দা সুলতানা সাহেবার পরবর্তীতে সেখানে দরবেশ চৌধুরী আব্দুল হক সাহেবের সাথে দ্বিতীয় বিয়ে হয়। তিনি (দরবেশ সাহেব) নাইয়ার সাহেবের ভাই-বোনকে নিজের দায়িত্বে নিয়ে নেন। জালালুদ্দীন নাইয়ার সাহেব প্রাথমিক শিক্ষা কাদিয়ানে গ্রহণ করেন। ১৯৬৩ সালে তিনি মৌলভী ফাযেল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এরপর আঞ্জুমানে ইন্সপেক্টর বাইতুল মাল হিসেবে তার প্রথম পদায়ন হয়। দীর্ঘকাল তিনি এই পদে সেবা প্রদান করেন। ভারতের সকল জামা'তে তিনি সফর করতেন আর এর মাধ্যমে অনেক পরিশ্রম করে আন্তরিকতার সাথে জামা'তের সদস্যদেরকে চাঁদার ব্যবস্থাপনায় অন্তর্ভুক্ত করেন। একারণেই তার সাথে পুরো ভারতের জামা'তগুলোর সদস্যদের সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্কও ছিল। ৬৩ বছর পর্যন্ত মরহুম জামা'তের সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেন। এই মেয়াদকালে তিনি ইন্সপেক্টর বাইতুল মাল আমদ, এরপর অডিটর, মুহাসিব আর এরপর দীর্ঘ সময় নায়েব বাইতুল মাল আমদ হিসেবে সেবা প্রদানের সুযোগ লাভ করেন। আমি যেভাবে বলেছি, তিনি সাত বছর সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়া, কাদিয়ানের সদর ছিলেন। এরপর যতদিন স্বাস্থ্যে কুলিয়েছে তিনি সদর মজলিসে তাহরীকে জাদীদেরও সদর ছিলেন। অনুরূপভাবে অঙ্গসংগঠনেও তার সেবা করার সৌভাগ্য লাভ হয়েছে। ইবাদতকারী এবং নামায-রোযা নিয়মিত পালনকারী ছিলেন। খিলাফতের প্রতি আহ্বানে সাড়া দানকারী ব্যক্তিদের মধ্যে প্রথম সারির অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ক্রীড়াবিদও ছিলেন, অ্যাথলেটও ছিলেন। এ দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি ক্রীড়া বিভাগকে অনেক সুসংগঠিত করেছেন। তার বিয়ে কাশ্মীরের একটি পরিবারে হয়েছিল। তার সহধর্মিণী পূর্বেই মৃত্যুবরণ করেছেন। মরহুমের দুই ছেলে এবং এক কন্যা রয়েছে, সবাই জামা'তের সেবা করছে। আল্লাহ্ তা'লা তার সাথে ক্ষমা ও দয়াসুলভ আচরণ করুন।

দ্বিতীয় স্মৃতিচারণ হলো মীর মুশতাক আহমদ সাহেবের পুত্র শ্রদ্ধেয় মীর হাবীব আহমদ সাহেবের। সম্প্রতি ৭৯ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। তিনি অত্যন্ত স্নেহশীল, মিশুক স্বভাবের এবং খিলাফতের প্রতি আত্মনিবেদিত সত্তা ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় মূসী ছিলেন। তার পরিবারে আহমদীয়াতের গোড়াপত্তন তার দাদা বাবু আব্দুর রহীম সাহেবের মাধ্যমে হয়েছিল। তিনি 'ফারুক' পত্রিকার সম্পাদক হযরত মীর কাসেম আলী সাহেব (রা.)-র মাধ্যমে ১৯০৩ সালে বয়আত গ্রহণ করেছিলেন। হযরত মীর কাসেম আলী সাহেব (রা.) মীর হাবীব সাহেবের পিতা মুশতাক আহমদ সাহেবকে পালকপুত্র হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন, কেননা হযরত মীর কাসেম আলী সাহেবের নিজের কোনো সন্তান ছিল না। মীর হাবীব সাহেব লাহোর সরকারি কলেজ থেকে আই.এসসি এবং পরে বি.এসসি সম্পন্ন করেন। এরপর তিনি পদার্থবিদ্যায় এম.এসসি ডিগ্রি অর্জন করেন। তারপর তিনি বহির্দেশে চলে যান।

তার জামা'তী সেবাসমূহ হলো– ১৯৭০ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত তিনি তা'লীমুল ইসলাম কলেজে শিক্ষক হিসেবে পাঠদানের মাধ্যমে সেবা প্রদানের সূচনা করেন। তখনো কলেজ জাতীয়করণ হয় নি। ১৯৭৩ থেকে ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত নুসরত জাহাঁ স্কীমের অধীনে সিয়েরা লিওনে যান। সেখানে ফ্রিটাউন-এ পদার্থবিদ্যার শিক্ষক হিসেবে সেবা প্রদানের সৌভাগ্য লাভ করেন। অতঃপর তিনি ১৯৭৬ সালে পাকিস্তানে ফেরত আসেন। এরপর ১৯৭৬ সালেই তিনি পুনরায় নাইজেরিয়ায় চলে যান আর সেখানে ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত সরকারি স্কুলে চাকরি করেন। সেখানে অর্থাৎ আফ্রিকায় থাকাকালীন তিনি ১৯৮৭ সালেই নিজ জীবন ওয়াকফ করেন। ওয়াকেফে যিন্দেগী হিসেবে ১৯৮৭ সালে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) তাকে হামরাশার আহমদীয়া সিনিয়র সেকেন্ডারি স্কুলের অধ্যক্ষ হিসেবে নিযুক্ত করেন, যেখানে তিনি ১৯৯১ সাল পর্যন্ত সেবা প্রদান করার সৌভাগ্য পেয়েছেন। এরপর তিনি পুনরায় পাকিস্তানে ফেরত আসেন ও এখানে এসেও জামা'তের সেবায় নিযুক্ত থাকেন। ১৯৯২ সালে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) তাকে একটি কারিগরি প্রতিষ্ঠানের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখার জন্য সিয়েরা লিওনে প্রেরণ করেন। সেখানে তার সুদক্ষ রিপোর্ট অনুযায়ী কিছু কাজ সম্পন্ন হয়। ১৯৯৬ সালে নাযারাত তা'লীমের অধীনে রাবওয়াতে নুসরাত জাহাঁ একাডেমিতে তার নিয়োগ হয় এবং তিনি পদার্থবিদ্যা পড়াতে থাকেন আর সে অবস্থায় তিনি অবসর গ্রহণ করেন। একইভাবে তিনি সদর উমূমী দপ্তরে আর উমূমী ইসলাহী কমিটিতে স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে সেবা করার সুযোগ পান।

তার স্ত্রী লেখেন, আমার স্বামী নামায-রোযায় অভ্যস্ত ছিলেন, অনেক কোমল স্বভাবের অধিকারী ছিলেন আর কখনো কোনো চাহিদা উপস্থাপন করতেন না। পড়ালেখা করতে খুব ভালোবাসতেন ও একজন জ্ঞানপিপাসু মানুষ ছিলেন। কেউ আসলে, উপহার আনতে চাইলে তার চাহিদা কেবল এটিই হতো যে, আমার জন্য বই নিয়ে এসো। আর তিনি জ্ঞানগর্ভ বইপুস্তক পড়তেন। একইভাবে তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বইও অনেক বেশি অধ্যয়ন করতেন। কখনো ভ্রান্ত কথা বলতেন না। কোনো কথা জানা না থাকলে নীরব থাকতেন, তবুও ভুল কিছু বলতেন না। তার মেয়েও একই গুণাবলির কথা বর্ণনা করেছেন। আমিও তাকে একজন ভদ্র মানুষ হিসেবে পেয়েছি আর নিজের কাজেই মগ্ন থাকতেন। এছাড়া ওয়াকফের দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা তার সাথে ক্ষমা ও দয়াসুলভ আচরণ করুন।

মীর মুহাম্মদ ইসহাক সাহেবের দৌহিত্রী সৈয়্যদা লুবনা সাহেবার সাথে তার বিবাহ হয়– যিনি মেজর সাঈদ আহমদ সাহেবের কন্যা ছিলেন। আর আমরা জানি, হযরত মীর মুহাম্মদ ইসহাক সাহেব ছিলেন হযরত মীর নাসের নওয়াব সাহেবের পুত্র; তিনি জামা'তের একজন সুবিদিত বুযুর্গ। তাঁর অনুবাদকৃত কুরআন করীম জামা'তে অনেক প্রসিদ্ধ। সর্বোপরি আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের প্রতি কৃপা করুন আর তার রূহের মাগফিরাত করুন। (আমীন)

(কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)